নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?

অভিজিৎ রায়

ছোটবেলায় এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতাম। জ্ঞানী-গুনি কিন্তু রসিক মানুষ। পেশায় অধ্যাপক। আমার সাথে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব আগ্রহ ভরে আলোচনা করতেন। তাঁর বাড়ীর নাম ছিল - 'সংশয়'। আমি একদিন না পেরে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম - 'সংশয় কেন?' উনি উত্তরে হেসে বললেন-'অভি, সংশয়ই হচ্ছে সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষ চোখ কান বন্ধ করে যে যা বলেছে তা বিশ্বাস না করে সংশয় প্রকাশ করেছে বলেই আমাদের সভ্যতা আজ এত দূর এগিয়েছে।' সত্যই তাই। ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। টলেমীর 'পৃথিবী-কেন্দ্রিক' মতবাদে কোপার্নিকাস আর গ্যালেলিওরা সংশয় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই টলেমীর মতবাদ একসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা একসময় 'ইথার' নামক কাল্পনিক মাধ্যমটির অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলেই পরবর্তীতে হাইগেনের তরঙ্গ-তত্ত্ব আর ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বকে সরিয়ে আলোর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পদার্থ-বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন আর ব্রগলীর তত্ত্বগুলো। হাটন আর লায়েলরা ৬০০০ বছরের পুরনো পৃথিবীর বয়সের বাইবেলের সংস্কারে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বলেই মিথ্যা বিশ্বাসকে সরাতে পেরেছিলেন মানুষের মন থেকে। এভাবেই সভ্যতা এগোয়। অনেকেই তর্ক করতে এসে নিজের বিশ্বাসের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন না; তখন খুব ভক্তি গদ গদ চিত্তে তোতাপাখীর মত আউরাতে থাকেন বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া নিরক্ত বাক্যাবলী - 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' অথবা 'মানলে তাল গাছ আর না মানলে গাব গাছ'। এ যেন ডুবন্ত মানুষের শেষ খড়কুটো আঁকরে ধরে অনেকটা যুক্তিহীনভাবেই অন্ধ-বিশ্বাসের পক্ষে সাফাই গাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কিন্তু যারা এধরনের বক্তব্য হাজির করেন তারা বোঝেন না যে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' এ ধরনের ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে আজও বোধ করি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরত। সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে; ক্যারেন আর্মস্ট্রং তার 'The Battle for God' বইয়ে যেটিকে একটু গুরুগম্ভীর ভাষায় বলেছেন - 'মিথোস্ থেকে লোগোস্ এর দিকে'। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধেরও একটি চমৎকার উক্তি রয়েছে- Doubt everything, and find your own light. গৌতম বুদ্ধের উক্তিটি যেন আধুনিক যুক্তিবাদীদের সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গীরই এক সংগঠিত রূপ- যেটি আসলে বলছে, কোন কিছুই বিনা প্রশ্নে মেনে নিও না! সেই একই সংশয়বাদী ভাবনার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আধুনিক কালে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় :

> "বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখ দ্বিতীয় বিদ্যায়।
> বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
> বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
> অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
> অনায়াসে সম্মতি দিও না।

কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিস্কার করে।"

সংশয়বাদ নিয়ে সামান্য কটি কথা খুব হাল্কাভাবে হলেও প্রথমেই সেরে নেওয়া হল একারণে যে, আজ আমরা সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করব, ব্যবচ্ছেদ করে দেখ্ব আমাদের সমাজের একটি বহুল-প্রচলিত মিথকে, যেটি ছোটবেলা থেকেই আমাদের শিখিয়েছে, ধর্ম পালন করা ছাড়া কখনই ভালমানুষ হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া।

ধর্ম ও নৈতিকতার জগাখিচুড়ি বনাম রূঢ় বস্তবতা :

প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বণ বলে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে গোড়া খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকার রাখে। ধর্ম গ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হল নৈতিকতা । আমাদের দেশী সংস্কৃতি তো আবার এগুলোতে সবসময়ই আবার আরও একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি সেই ছেলেবেলা থেকেই ছোট ছেলে মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবী পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরি-কীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখীর মত আউরানো হয় নিরক্ত বাক্যারলী - *'অ্যাই বাবু- এগুলো করে না - আল্লাহ কিন্তু গুনাহ দিবে'*। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলে-পিলেদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, জাকাত, কৃষ্ণলীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণ মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুরে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোন বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কখনই কাজ করেনি। কারণটা অতি পরিস্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভাল মানুষকে পুরষ্কৃত করেন আর পাপী-তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায় পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যে কোন উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরষ্কার বগলদাবা করতে

পারলে কোন বান্দাই আর নৈতিকতা-ফৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানী, নামাজ, হজ্জ, কোরাণ তেলাওয়াত, পুজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোন ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশী, তারাই কিন্তু বেশী-বেশী 'আল্লা-আল্লা' করে চ্যাঁচায়। হাজী সেলিমের মত পান্ডারই হজ্জ্ব করার প্রয়োজনটা পড়ে বেশী, এরশাদের মত লম্পটেরই 'আলহাজ্জ্ব' হওয়ার শখ হয় প্রবল। কারণ ধর্মেই রয়েছে সমস্ত আ-কাজ, কু-কাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী, তিরুপতি, এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চন্ত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারী তাই ধুম-ধাম করে পুজা-যজ্ঞ করে নয়ত শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় 'সমাজের ভালোর জন্য'।

উপরন্ত, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ সচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পণা মাত্র। রাহুল সঙ্কৃত্যায়নের ভাষায়-'অজ্ঞানতার অপর নামই হল ঈশ্বর।' কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মূলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাহিনী আজ অনেকের কাছেই 'শিশুতোষ ছড়া' ছাড়া আর কিছু নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তার Why I am not a Christian গ্রন্থে বলেন :

> ধর্ম সম্পর্কে দু ধরণের আপত্তি করা যায় -বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে, কোন ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশ গুলো এমন সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এই উপদেশগুলি অমানবিকতাকে চিরন্তণ করবার জন্যই তৈরী। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য না করা হত, তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরো অনেক উন্নত হত।

আমি একবার এক ওয়েব সাইটের জন্য ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। লেখা শুরু করতে না করতেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,

> 'শ্রী অভিজিত রায়দের মত ব্যক্তি বর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভূত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরানে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বর। এদের হৃদয়ে সীল মোহর এঁটে দেওয়া আছে। তারা কিছুই দেখতে পায়না এবং শুনতে পায়না। শুধু প্রাণীর মত হাম্বা হাম্বা রব তোলে।'

কোরাণে যদি সত্যই এমনটি বলা থাকে (এবং কোরানে সত্যই অবিশ্বাসীদের অন্ধ/বর্বর, এবং এদের হৃদয়ে যে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে তা বলা আছে; দেখুন সুরা ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইত্যাদি) বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেবল ধর্ম মানি না বলেই ভদ্রলোক আমায় 'অন্ধ' ও 'বর্বর' বলেছেন, আর প্রমাণ স্বরূপ 'সাক্ষী গোপাল' মেনেছেন

তার চীর-আরাধ্য ওই ধর্মগ্রন্থকেই। শুধু যে কোরানেই অধার্মিকদের সম্বন্ধে এ ধরণের বিষেদগার করা হয়েছে তা ভাবলে ভুল হবে। শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকদের প্রাচীন কালের নাস্তিক্যবাদী চার্বাক দর্শনকে 'লোকায়াত' বা ইতর লোকের দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুচ্ছ-আচ্ছিল্য করার প্রবণতাটির কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতেই পারে। এমনকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় যে, মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাকের নাম থেকেই নাকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মহাভারতে আছে -চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু এক দুরাত্মা রাক্ষস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ের পর চার্বাক ব্রাক্ষ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাক্ষ্মণেরা তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাকের চালাকি ধরে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। বোঝাই যায়, প্রাচীন ভাববাদীরা এই নাস্তিক্যবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন ঘৃণ্য চরিত্রের রাক্ষসের সাথে দর্শনটিকে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আরেকটি উদাহরণ দেখি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধণী বনিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাক্ষ্মণকে ধাক্কা মেরে দিল। ক্ষুব্ধ ব্রাক্ষ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করল। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাক্ষ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাক্ষ্মণকে তার পশু জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন অনেক জন্মের পূন্যের ফল সম্বল করে এই মানব জন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম এই মানবজীবন আর তায় আবার ব্রাক্ষ্মণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও কি কেউ আত্মহত্যা করে? কাজেই অভিমানে অত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিয়াল বলল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাক্ষ্মণ হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু সেই জন্মে সে চূড়ান্ত মূর্খের মত এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম। চূড়ান্ত মূর্খের মত কাজটি কি? এ বারেই কিন্তু বেরিয়ে এল নীতি কথা -

অহমাংস পন্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাক্ষ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পন্ডিতমানিকঃ
ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ (শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

(অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ সমালোচক পন্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচার সভায় ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রক্ষ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা পন্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাক্ষ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।)

বোঝাই যায়, বৈদিক যুগেও যুক্তিবাদীদের সংশয়, অযাচিত প্রশ্ন আর অনর্থক তর্ক-বিতর্ক একটা ‘ফ্যাকটর’ হয়ে উঠেছিল। 'পন্ডিত্যাভিমানী মূর্খ' - এধরণের লেবেল এঁটে দিয়ে বেদ-সমালোচকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত বহন করে। আজকেও কি এ দৃষ্টিভঙ্গীর খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? যে ভদ্রলোকটি আমাকে ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করার জন্য 'অন্ধ' বা 'বর্বর' হিসেবে চিত্রিত করছেন, সে ধরনের লোকজনের কিন্তু আজো সমাজে অভাব নেই, নাস্তিক শুনলেই তারা খ্যাঁক করে উঠেন - 'ও তুমি নাস্তিক! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই'। এরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভাল-মানুষ ভাবা তো আনেক পরের কথা। কিন্তু, নাস্তিক মানেই কি অনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? এমনিভাবে ভাবার মোটেই কোন কারণ নেই। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে ঈশ্বর নামক মুলাটি সরিয়ে বাস্তবসম্মত ভাবে 'মরালিটি' বা নৈতিকতা কে দেখবার পক্ষপাতি। ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থ্য সমাজ গড়ে তুলবার প্রয়োজনেই মানুষের চুরি-দারি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলি গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তি-মূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই অধার্মিকদের চোখে 'নৈতিকতা' বেহেস্তে যাওয়ার কোন পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক-মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১ সালের কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হত-বিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কি করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে।

এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাতে-পাঁচে নেই; সাদা চোখে দেখলে নিতান্ত ভালমানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন যে একাত্তরে ভদ্রলোক এহেন দুষ্কর্ম নেই যে করেননি। সে সময় এমনকি তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, খান-সেনারা যদি কোন বাঙালী মেয়েকে ধর্ষণ করে তবে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না, বঙ্গনারীরা পাক-বাহিনীর জন্য 'মালে গনিমত', কারণ তারা ইসলামের জন্য লড়ছে। এমন নয় যে ভদ্রলোক অশিক্ষিত ছিলেন, অথবা ছিলেন বুদ্ধিহীন। বরং সৎ এবং হৃদয়বান হিসেবেই একটা সময় তার খ্যাতি ছিল; কিন্তু এই ‘সজ্জন’ ব্যক্তিও স্রেফ ধর্মের প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে নেমে গেলেন পশুর স্তরে। উনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। তাই ধর্ম বাঁচাতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। এমনকি খান সেনাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। ব্যাপারটি আনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণদের জন্য এ ধরণের কাজ খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই মানবিকতার চেয়ে তাদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভদ্রলোকের কথা ভাবলেই নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ভাইনবার্গের বিখ্যাত উক্তিটি আমার মনে পড়ে যায় :

> 'ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভাল মানুষেরা ভাল কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভাল মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।'

শুধু একাত্তর তো কেবল নয়, বছর কয়েক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, আর তারও আগে অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদ ভেংগে শিবসেনাদের তান্ডব নৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করে দেয়। আপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতি মানবিক সত্ত্বা-কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোন বিশ্বাস নেই, একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে উঠতে পারেন একজন যথার্থ প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে এক লেখক মাসিক দেশ পত্রিকার ৪ নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় 'নাস্তিকতার সংজ্ঞা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন - 'নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিক সত্ত্বায় নয়, তার চেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতার প্রায় সমস্ত অপবিশ্বাসে । সব কিছুই তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান।' এর মধ্যে যে কিছুটা হলেও যে সত্যতা নেই তা নয়। তবে ভালমানুষ হোন, আর নাই হোন এটা কিন্তু ঠিক যে নাস্তিক বা অধার্মিকদের মধ্যে থেকে কখনোই আল-কায়েদা, তালিবান, হরকত-উল-জিদাদ, রাজাকার, আলবদর বা শিবসেনাদের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মুল্যবোধ অর্জনে বাঁধা দিবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে উঠবে সার্বজনীন মানবতাবাদ। সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শরুও হয়েছে । ঈশ্বর কেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিয়ে শুধু মানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মনবতাবাদী সমিতি এবং যুক্তিবাদী সমিতি অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে 'হিন্দু', 'মুসলিম' এই শব্দ গুলির পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় 'মনুষ্যত্ব' শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে । এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি তার অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি –

> আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুঁরির ধর্ম যেমন তীক্ষ্নতা তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পুজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।

ধর্মগ্রন্থগুলো কি সত্যই নৈতিকতার ধারক এবং বাহক ?

ইদানিং এক নতুন ধরনের প্রগতিবাদী (নাকি সুবিধাবাদী) আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হল ধর্ম নয় কেবল মৌলবাদকে আঘাত কর। অনেক মুক্ত-মনা যুক্তিবাদীদের অনেকেই দেখছি বুঝে হোক, না বুঝে হোক এ প্রচারনায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতই ইদানিং সোচ্চারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছেন : 'শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও মৌলবাদ রুখব', যেন মৌলবাদ ব্যাপারটি হঠাৎ করেই আকাশ

থেকে আবির্ভুত হয়েছে মহীরুহ আকারে - কোন শিকর-বাকর ছাড়াই। যারা ধর্মকে শ্বাশত চিরন্তন আর জনকল্যানমমূলক বলে মনে করেন আর যত দোষ চাপাতে চান কেবল গোলাম আজম, আদভানী কিংবা 'মৌলবাদ' নামক নন্দঘোষটির ঘারে, তাদের প্রথমে খোদ 'মৌলবাদ' শব্দটিকেই বিশ্লেষণ করতে দেখতে বলি। 'মৌল' শব্দের অর্থ মূল থেকে আগত, বা 'মূল সম্বন্ধীয়'। আর 'বাদ' শব্দের অর্থ যে 'মত', 'তত্ত্ব' বা 'থিওরী', তা তো আমরা জানিই। তা হলে মৌলবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি দাঁড়ালো? দাঁড়ালো - 'মূল থেকে আগত তত্ত্ব'। কোন্ মূল থেকে আগত তত্ত্ব? শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মগ্রন্থের গোঁড়া মূলনীতিগুলো হতে আগত তত্ত্ব। কাজেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিন্তু থলের বিড়াল ঠিকই বেড়িয়ে পড়ছে যে, ধর্মশাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে চরম সত্য বলে যারা মনে করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী হন। মৌলবাদ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Fundamentalism'। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশেনারীতে বলা হয়েছে - "Strict maintenance of traditional scriptural beliefs'; চ্যাম্বার্স ডিকশেনারী শব্দটি সম্পর্ককে বলছে "Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.'। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে মৌলবাদ রুখবার চেষ্টা অনেকটা বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রেখে আগায় কাঁচি চালানোর প্রচেষ্টা, নিছক ভন্ডামী। তসলিমা নাসরীন একবার একটি ইংরেজী সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

> আমি সাধারণভাবে মৌলবাদীদের আর সেই সাথে ধর্মের- দু-এরই সমালোচনা করেছিলাম। আমি আসলে ইসলামের সাথে ইসলামী মৌলবাদের কোন তফাৎ দেখি না। আমি মনে করি ধর্মই হচ্ছে মূল উ্স, যেটি থেকে মৌলবাদ নামক বিষাক্ত ডালপালাগুলো সময় সময় বিস্তার লাভ করে। যদি আমরা ধর্মকে অক্ষত রেখে দেই, কেবল মৌলবাদ নামক একটি ডালকে ছেঁটে ফেলতে সচেষ্ট হই, দেখা যাবে কিছু দিন পর মৌলবাদের আরেকটা শাখা অচীরেই বেড়ে উঠেছে। আমি খুব পরিস্কারভাবেই এটি বলছি কারণ, কিছু উদারপন্থী লোকজন আছেন যারা এ ধরনের প্রশ্নে ইসলামকে ডিফেন্ড করেন আর সমস্ত সমস্যার জন্য কেবল মৌলবাদীদের ঘারে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো নারী-নির্যাতনকারী। ইসলাম নিজেই তো গণতন্ত্র সমর্থন করে না আর সমস্ত মানবিক অধিকার হরণ করে'।

আমার এক পরিচিতজন আছেন- সেক্যুলার এবং প্রগতিশীলতার দাবীদার। কিন্তু তসলিমার এই সাক্ষাৎকার পড়ে তার যেন পিত্তি জ্বলে গেল! তসলিমা 'শ্যালো', তসলিমা 'নির্বোধ', তসলিমা 'ইডিয়ট', কী নন তিনি! বুঝলাম, তসলিমার বড় অপরাধ তিনি ধর্ম আর মৌলবাদকে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু তসলিমা ভুল বলছেন না ঠিক বলছেন সেটি বিশ্লেষণ করতে হলে নির্মোহ সংশয়বাদী দৃষ্টকোন থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকানো দরকার। আসুন প্রিয় পাঠক, আমরা যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করে দেখি- ধর্মগ্রন্থ গুলোর সাথে মৌলবাদের সত্যই কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা, এবং ধর্মগ্রন্থ গুলো আদপেই *'নৈতিকতার ভান্ডার'* হিসেবে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে কিনা!

ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কি বলছে? পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২-৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম কিংবা খ্রীষ্ট ধর্ম কোনটাই সে অর্থে চিরন্তন বা সনাতন নয়। কাজেই 'সনাতন

ধর্ম' নিছকই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু হয়েছিলো বহু হাজার বছর আগে। বিরূপ প্রকৃতির নানা দুর্যোগ - দাবানল, প্লাবণ,বজ্রপাত প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে অসহায় হয়ে আর ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলো নানা দেবদেবীর; মৃত্যুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে সৃষ্টি করেছিল অদৃশ্য আত্মার। যারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য পড়াশুনা করেছেন তারাই এগুলো জানেন। আর এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের মধ্যে তথাকথিত 'ধর্মবিশ্বাসের' সৃষ্টি হয়েছিল নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে ধর্মাচরনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাস গুলো ছিল একেবারেই আদিম- আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা। এখন থেকে ৪০-১৮ হাজার বছর আগে উচ্চতর পুর-প্রস্তর যুগে এসে আত্মা, পরমাত্মা, ধর্মীয় আচার আর যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলো সুসংহত হয়। আজকের দিনের ধর্মবিশ্বাস গুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্মের (হিন্দু ধর্মের পূর্বসুরী) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর আগে, ইসলাম ধর্ম এসেছে ১৪০০ বছর আগে, খ্রীষ্টধর্ম ২০০০ বছর আগে, ইত্যাদি। একটা সময় সামাজিক প্রয়োজনে যে ধর্মীয় রীতি নিতি নিয়ম কানুন তৈরী হয়েছিল, আজ তার অনেকগুলিই কালের পরিক্রমায় স্থবির, পশ্চাৎপদ, নিবর্তনমূলক এবং অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় ফোনিকান, হিব্রু, ক্যানানাইট, মায়া, ইনকা, এস্টেক, ওলমেক্স, গ্রীক, রোমান কার্থাগিনিয়ান, টিউটন, সেল্ট, ড্রুইড, গল, থাই, জাপানি, মাউরি, তাহিতিয়ান, হাওয়াই অধিবাসী - সবাই নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী দেদারসে শিশু, নারী, পুরুষ বলি দিয়েছে তাদের অদৃশ্য দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে।

কিছু সভ্যতায় দেখা যায়, যখন কোন নতুন প্রাসাদ কিংবা ইমারত তৈরি করা হত, তার আগে সেই জায়গায় শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত - এই ধারণা থেকে যে, এটি প্রাসদের ভিত্তি মজবুত করবে। অনেক আদিম সমাজেই বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারী উৎসর্গ করার বিধান ছিল; কেউ কেউ সদ্যজন্মলাভ করা শিশুদের হত্যা করত, এমনকি খেয়েও ফেলত। কোন কোন সংস্কৃতিতে কোন বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে অন্য মহিলা এবং পুরুষদেরও তার সাথে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, যাতে তারা পরকালে গিয়ে পুরুষটির কাজে আসতে পারে। ফিজিতে 'ভাকাতোকা' নামে এক ধরনের বিভৎস রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে একজনের হাত-পা কেটে ফেলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই কর্তিত অংগগুলো খাওয়া হত। আফ্রিকার বহু জাতিতে হত্যার রীতি চালু আছে মৃত-পূর্বপুরুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য। ভারতে সতীদাহের কথা তো জানাই। এগুলো সবই মানুষ করেছে ধর্মীয় রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে। এধরনের 'ধর্মীয় হত্যা' সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য ডেভিড নিগেলের 'Human Sacrifice: In History And Today' বইটি পড়া যেতে পারে।

এবার আসি প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রসঙ্গে। পবিত্র কোরাণের বেশ অনেকটা জুড়েই রয়েছে অনর্থক উত্তেজক নির্দেশাবলীর ছড়াছড়ি, যেগুলো 'মৌলবাদের সুতিকাগার' হিসেবে আজ কারো মনে হতেই পারে। যেমন :

কোরান মুমিন ভক্তদের শেখাচ্ছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (৮:৬৫)। কোরাণ শেখাচ্ছে বিধর্মীদের অপদস্ত করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯:২৯)। কোরাণ অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (৫:১০), এবং 'অপবিত্র' বলে সম্বোধন করে (৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যত ক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামী রাজত্ব কায়েম হয় (২:১৯৩)। কোরাণ বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে পুঁতি দুর্গন্ধ ময় পূঁজ (১৪:১৭)। এই 'পবিত্র' গ্রন্থটি অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে আপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে আর ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে- 'তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি' (৫:৩৪)। আরও বলছে, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর' (২২:১৯)। কোরাণ ইহুদী এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (৫:৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি আবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (৯:২৩, ৩:২৮)। আল্লাহ তার কোরাণে পরিস্কার করেই বলছে - আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড (৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোর ভাবে উচ্চারিত হবে - 'ধর ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে আর তাকে শৃংখলিত কর সত্তুর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে' (৬৯:৩০-৩৩)। মহানবী সবসময়ই আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন সাফাই গেয়েছেন এই বলে - 'এটা আমাদের জন্য ভালই, এমনকি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও' (২:২১৬), তারপর উপদেশ দিয়েছেন - 'কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর' আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর বলেছেন অবশিষ্টদের ভালভাবে বেঁধে ফেলতে (৪৭:৪)। পরমকরুনাময় আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন - 'কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব' এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আংগুলের ডগা ভেঙ্গে দিতে (৮:১২)

আল্লাহ জ্বিহাদকে মুমিনদের জন্য 'আবশ্যিক' (mandatory) *করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে -'তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আস (জ্বিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি'(৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, 'হে*

নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর আর কঠোর হও- কেননা, জাহান্নামের মত নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হল তাদের পরিনাম' (৯:৭৩)।

এই হচ্ছে কোরাণ (হাদিস এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলোর কথা না হয় বাদই থাকুক আপাততঃ)। অনেকেই দেখেছি নিজস্ব বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে কোরানকে নির্দ্বিধায় "The book of guidance' বলে মেনে নেন, আর ইসলামকে মনে করেন 'শান্তির ধর্ম'। যারা এমনটি ভাবেন, তারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে উপরের আয়াতগুলো কেউ যদি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায় তবে তারা কি ধরনের শান্তিএ পৃথিবীতে বয়ে আনবে? জ্বিহাদীদের কল্যাণে আজকের বিশ্বে 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদ' (Islamic Terrorism) একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় এই জ্বিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে মানুষ-জন, বাড়ী-ঘর, কারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র-সৈকতে। হাজার খানেক জ্বিহাদী সংগঠন যেমন - আল্ কায়দা, ইসলামিক জ্বিহাদ, হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জ্বিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহ্-রিখ-এ-নিফাজ-সারিয়াত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর-মুজাহিদিন, জামায়ে ইসলামিয়া, হিজাব-এ-ইসলামিয়া আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কায়েম করছে এক ত্রাসের রাজত্ব । ২০০৫ সালের ১৭ ই অগাস্ট সারা বাংলাদেশে একনাগারে ৬৩টি জেলায় একনাগারে বোমার মহড়া হয়ে গেল। মহড়ার প্রকোপ এমনই ব্যাপক ছিল যে অনেকেই ১৭ ই আগাষ্ট দিনটিকে এখন 'বাংলাদেশের ৯/১১' বলে অভিহিত করতে শুরু করেছেন। জঙ্গিবাদের সাথে বিশুদ্ধ ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা বোঝা হয়ে গেছে বোমা মহড়ার স্থানগুলোতে পাওয়া তাদের ছাপানো লিফলেটগুলো থেকেই। সারা লিফলেট জুড়েই কোরাণ হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি আর কাফের নাফরমানদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদের ডাক। ফরহাদ মজহার আর বদরুদ্দিন উমরেরা পালের হাওয়া যতই অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করুক না কেন, বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা আর অস্বীকার করার জো নেই । সচেতন শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের আজ আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে, সময় এসেছে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে প্রশ্ন করার - কেন এই জঙ্গি দলগুলো এত ইসলামিক? কেন তারা সন্ত্রাসী? কারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে মোল্লা ওমর, বিন-লাদেন, মৌলানা মান্নান, গোলাম আজম, শাইখ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নান আর বাংলাভাইদের? কে ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে? আজ অত্যন্ত পরিস্কারভাবে তাই বলার সময় এসেছে - এই 'পবিত্র' ধর্মগ্রন্থগুলো অনেকাংশেই মুসলিমদের ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। তবে সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষমূলক পররাষ্ট্রনীতির কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না । জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জ ভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু যে আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে তা নয়, ইসলামী বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যে কোন কারণেই হোক 'ইসলামের উপর আঘাত' হিসেবে নিয়েছে। সেজন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সে সমস্ত দেশেই ইসলামী আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশী যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে। প্যালেস্টাইনীদের বঞ্চিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে

ইসরায়েলকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে তাও মুসলিম সমাজকে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোন আলোচনাই কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করাও বোধ হয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাষ্ট্রযন্ত্র কিভাবে ধর্ম ও মৌলবাদকে লালন করে, পালন করে আর সময় বিশেষে উস্কে দেয় তার একটি বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করবে কি করবে না, কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র তুলে ফেলা হবে কি হবে না, স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হবে কিনা, আর হলে কিভাবেই বা পড়াতে হবে, সব কিছুই সূক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করছে সরকার। বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর কাজকর্ম নৈতিক না অনৈতিক - এ নিয়েও উপযাজক হয়ে জ্ঞানগর্ভ মত দিতে এগিয়ে আসছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত অর্ধশিক্ষিত পাদ্রী আর যাজকেরা। যুদ্ধের আগে নবী-রসুলদের মতই 'ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর' শুনতে পাচ্ছে সে দেশের প্রেসিডেন্ট; মিডিয়া, বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠি আর প্রকাশক নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন্ খবরে আমরা বিশ্বাস করব, আর কোন খবর চেপে যাওয়া হবে। আসলে 'মুক্ত বিশ্বের' কথা মুখে বলে এভাবেই নাগরিক রুচি, চাহিদা, চেতনা আর পুরো জীবনধারাকেই নিয়ন্ত্রন করতে চাইছে ধর্মান্ধ শাসককুল আর ধনকুবের গোষ্ঠি; সে অন্য এক ইতিহাস।

ধর্ম, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার একটা বড় সমস্যা হল অযাচিত 'স্টেরিওটাইপিং' এর ভয়। এ ধরণের আলোচনা শুরু হলেই আমি দেখেছি বিশ্বাসীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকেন - শুধু গুটি কয়েক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিক ভাবে ইসলামকে বা মুসলীমদের দায়ী করা কি ঠিক হচ্ছে ? একজন বিন লাদেন বা একজন মুফতি হান্নান কি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি? না, সত্যই করে না। কাজেই আমিও বলি যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠিকে কখনওই সন্ত্রাসী বলা উচিৎ নয়, যারা এ ধরনের 'স্টেরিওটাইপিং' করতে চান তাবা ভুল করেন। এটি একধরনের Racism । কেউ বা বলেন এটি এক ধরনের রোগ - 'ইসলামোফোবিয়া'! রোগ ই বলুন আর পশ্চিমা জাত্যাভিমানই বলুন (যাকে প্রয়াত এডোয়ার্ড সাইদ অভিহিত করেন 'ওরিয়ান্টালিজম' নামে), ৯/১১ এর পর পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত মুসলিমরা এ ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই - এ তো অস্বীকার করবার জো নেই। মুসলিম মানেই যে 'সন্ত্রাসী' নয় এটি বোঝার জন্য তো কোন দর্শন কপচানোর দরকার নেই, আমার-আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট হবার কথা। আমার নিজেরই অনেক মুসলিম বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। তাদের কেউই তো সন্ত্রাসী নন। কেউই বিন লাদেন নন, কেউই নন মুফতি হান্নান। তারা আমার বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্প-গুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমন কি নামাজের সময় হলে এই কাফিরের বাসায় ‘পশ্চিম দিক কোনটা’ জানতে চেয়ে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভাল মানুষ। তারা কোরানের কোন আয়াতে ভায়োলেন্সের কথা আছে তা সম্বন্ধে মোটেও ওয়াকিবহাল নন, সেটা নিয়ে আগ্রহীও নন- তারা আসলে 'Spiritual Islam' এর চর্চা করেন। বিপদটা কখনই এদের নিয়ে নয়। এরা সবাই শান্তি, ভালবাসা আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো তারা যতটা না ইসলাম থেকে পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ছোট বেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কোনদিন কোরাণের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুনাবলীগুলো বর্জিত নয়, এমন প্রমাণ ভুরি ভুরি হাজির করা যায়। কিন্তু এই 'Spiritual Islam' এর চর্চাকারী দলের বাইরেও একটা অংশ রয়েছে যারা

রীতিমত কোরাণের চর্চা করেন, চোখ-কান বন্ধ করে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর কোরাণের আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। কারণ কেউ যদি সামাজিক শিক্ষার বদলে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নেন তাহলে কি হবে ? নীচের আয়াতটায় চোখ বুলানো যাক -

> *Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah (Q. 3:28)*

যারা কোরানের মধ্যে কখনও ভায়োলেন্সের টিকিটিও খুঁজে পান না, বরং পবিত্র কোরানের আলোকে জীবন সাজাতে চান, তারা নিজেরাই কি তাদের কোন হিন্দু, খ্রীস্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরাণে বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তারা কি সত্যই শুধুমাত্র অমুসলিম বলেই কারো বন্ধুত্ব প্রত্যাখান করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় যে তারা আসলে কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তু কোরাণ তো 'আল্লাহর কিতাব'। যদি কেউ যদি ভাসা ভাসা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরানের চর্চা না করে কোরাণের সকল নির্দেশ আক্ষরিক ভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন আর অবশেষে সাম্প্রদায়িক 'তালিবান' হিসেবে বেড়ে উঠেন, তবে দোষটা কার হবে?

আরেকটি আয়াত দেখি -

> *Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you (Q. 2:216)*

অথবা,

> *Then fight in Allah's cause - Thou art held responsible only for thyself - and rouse the believers. It may be that Allah will restrain the fury of the Unbelievers; for Allah is the strongest in might and in punishment (Q. 4:84).*

কোরাণের বর্ণিত নির্দেশ মত জ্বিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালিবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আফগানিস্তান চলে গিয়েছিলেন অনেকেই; কারণ ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা আল্লাহর নির্দেশ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তাদের যে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় তাও নয়। এমনি একজন ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে John Phillip Walker Lindh (transformed as Abdul Hamid- বিখ্যাত 'আমেরিকান তালিবান'। দৈনিক প্রথম আলোর ১৮ ই অক্টোবর রিপোর্টে প্রকাশিত

হয়েছে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল । কোরাণের অমানবিক শিক্ষাই যে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে 'কাফিরদের' বিরুদ্ধে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ী, এটি অস্বীকার করার চেষ্টা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ স্পর্শকাতর বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে সবসময়ই ঘুরে ফিরে ৯/১১'র ঘটনাটি সামনে চলে আসে। ৯/১১ এর ঘটনায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিলো কি করে কিছু ধর্মোন্মাদ জ্বিহাদী সৈনিক উড়োজাহাজকে অস্ত্র বানিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। যারা ইসলামের মধ্যে প্রতিনিয়ত শান্তি খোঁজেন, তারা বলবেন, এগুলো কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীদের কাজ - যার সাথে প্রকৃত ইসলামের সাথে কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই 'কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারী'রা তো আর নিজেদের দুষ্কৃতকারী ভাবেনি। বরং ভেবেছে তারাই সাচ্চা মুসলিম, যারা কিনা আল্লাহর দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। ৯/১১ ঘটার অনেক আগেই - ১১ই জানুয়ারী ১৯৯৯ এর নিউজ উইকের একটি সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাতকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাতকারে লাদেন সাহেব পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে 'জায়েজ' মনে করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্য কিছুঅংশ তুলে দেওয়া হল -

> QUESTION: "Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam prohibits its followers from killing civilians in war?"
>
> BIN LADEN: "If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if the majority of the American people support their dissolute president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them.
>
> QUESTION: "All Americans?"
>
> BIN LADEN "Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.

হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোন অর্থেই ভাল বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষ-বাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুড়ে কুড়ে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার সয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা

পাই- মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাক্ষ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাক্ষ্মণদের মাথা থেকে আর শুদ্রদের পা থেকে তৈরী করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড় ই মহান! শুদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই 'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট' উঁচু জাতের ব্রাক্ষ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন- দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শুদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে ‘পবিত্র’ করা হত (ক্ষেত্র বিশেষে এখনও হয়)। আর হবে নাই বা কেন ! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, 'আপনি বাড়ীতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না'! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শুদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগের ও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে -এই ছিল মনুর বিধান - 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্ত্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শুদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুনতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শুদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শুদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শুদ্ররা যে ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)। একজন শুদ্রকে বেদ পাঠ তো দূরের কথা, শ্রবনেরও অধিকার দেওয়া হয়নি। একজন শুদ্রকে তার উঁচু জাতে বিয়ে করবার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এজন শুদ্র যদি ব্রাক্ষ্মণের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ে, তবে তার বুকে গরম লোগার রডের ছ্যাকা দেবার অথবা পশ্চাৎদেশ কর্তন করে নেবার বিধান রয়েছে (৮: ২৮১)।

মনুর এসব বর্ণবাদী নীতির বাস্তব রূপায়ন আমরা দেখতে পাই রামায়ন ও মহাভারতে। বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন যে শ্রেনী বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং শূদ্রদের দমন-নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ রামায়নের শম্বুকবধ কাহিনী। তপস্যা করার 'অপরাধে' রামচন্দ্র খর্Iগ দিয়ে শম্বুক নামক এক শূদ্র তাপসের শিরোচ্ছেদ করেন তার তথাকথিত রামরাজ্যে ।

প্রায় একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখি মহাভারতে যখন নিষাদরাজ হিরন্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোনাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে তাকে নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন দ্রোণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের প্রিয় ছাত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রক্ষার অভিপ্রায়ে 'গুরু দক্ষিণা' হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নেন তিনি। এ ধরণের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে।

আসলে এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠমোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্যের সমাজের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্মই তৈরী করেছিল হুজুর-মুজুর শ্রেনীর কৃত্রিম বিভাজনের, কিংবা হয়ত বলা যায় শোষক শ্রেণীই শ্রেনী বিভক্ত সমাজের ফায়দা পুরোপুরি লুটবার জন্য প্রথম থেকেই কাজে লাগিয়েছিল ধর্মকে; যে ভাবেই দেখি না কেন এর ফলে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের। এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্যই ব্রাক্ষ্মণেরা প্রচার করেছিল - ধর্মগ্রন্থগুলো সয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত! ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত সুদুরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে।

ইসলামী জ্বিহাদী সৈনিকদের মতই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার 'সনাতন ধর্ম' রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় সয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরং দলের মত প্রতিক্রিয়াশীল দল গুলো। কয়েক দশক আগেও ভারতে নবহিন্দুত্বের তেমন কোন সংঠিত রূপ ছিল না । তবে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামোর জনসাধারণের কাছে সন্নাসী, গেরুয়া, জটা, দন্ড, রুদ্রাক্ষ, কমন্ডুলু এসব দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্ভ্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা জানে। এই ধর্মীয় ভাবালুতা কে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৯৮-৯০ সালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দুরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হল রামায়ন আর মহাভারত। সরকারী প্রচার মাধ্যমে এভাবে অন্ধ বিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলে ভারতে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার উন্মোচিত হল, রোপণ করা হল এক বিষ-বৃক্ষের চারা। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে কল্পিত রাম জন্ম-ভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তার ‘মহাকাব্য ও মৌলবাদ’ বইয়ে বলেন:

> দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে রামায়ন ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাকাব্যিক প্রতিফলন হিশেবে অথবা ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যের অমুল্য ধ্রুপদী সম্পদ হিশেবে গন্য না করে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিশেবে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানেই আমাদের গভীর লজ্জা। প্রথমে ১৯৮৮-৯০ সালে এবং আরও কয়েকবার সরকারী দুরদর্শনে রামায়ন ও মহাভারত যে অবয়ব ও প্রকাশভঙ্গিমায় সম্প্রচারিত হয়েছে, তা এই মৌলবাদী রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে বলেই মনে হয়। দুরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়নের কাহিনী প্রধানত তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, বাল্মীকি রামায়নকে ভিত্তি করে নয়। তুলসী রামায়নের কাহিনী মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষনব ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষনব ভক্তি সাহিত্যের অন্তর্গত। আদি বাল্মীকি রামায়নে বালকান্ড ও উত্তর কান্ড ছিল না। আর পরবর্তী কালে সংযোজিত এই দুই কান্ড এবং সনশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত কথা বাদ দিলে আদি বাল্মীকি রামায়নে রামের অবতারত্বের বিশেষ চিহ্ পাওয়া যায় না। মহাকাব্য হিশেবেও রামায়নের সাহিত্যগুন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুলসী রামায়নে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ট দেবতা রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। যা

> এমনকি বালকান্ড ও উত্তরকান্ড সহ পল্লবিত বাল্মীকি রামায়নেরও প্রধান বিষয়বস্তু নয়। দূরদর্শনে এভাবে রামায়নকে মহাকাব্য হিশেবে উপস্থিত না করে বিকৃতরূপে অবতারকাহিনী ও ধর্মগ্রন্থরূপেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারী প্রচারমাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উ্সাহ দেওয়ার ফলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ন চলাকালে রামজন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই এর অকাট্য প্রমাণ।

বছরখানেক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া স্মরণকালের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা আমরা দেখেছি। ধর্মের মায়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষ কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে আর নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে - গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তার প্রমাণ। তারপরেও কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করলে মৌলবাদীদের সাথে সাথে অনেক প্রগতিপন্থিরাও একাট্টা হয়ে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ান!

ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের পবিত্রগ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরো বাইবেলটিতেই ঈশ্বরের নামে খুন, রাহাজানি, ধর্ষনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ তো দেওয়া যেতেই পারে। যুদ্ধজয়ের পর অগনিত যুদ্ধবন্দিকে কব্জা করার পর মুসা (মোশি) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আদেশ হিশেবে সমস্ত বন্দী পুরুষকে মেরে ফেলতে:

> এখন তোমরা এই সব ছেলেদের এবং যারা কুমারী নয় এমন সব স্ত্রী লোকদের মেরে ফেল; কিন্তু যারা কুমারী তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ' (গণনা পুস্তক, ৩১: ১৭-১৮)।

একটি হিসেবে দেখা যায়, মুসার নির্দেশে প্রায় ১০০,০০০ জন তরুন এবং প্রায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীকে হত্যা করা হয়েছিল । এছাড়াও নিষ্ঠুর, আক্রামনাত্মক এবং অরাজক বিভিন্ন ভার্সসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় যিশাইয় (২১: ৯), ১ বংশাবলী (২০:৩), গণনা পুস্তক (২৫: ৩-৪), বিচারকর্তৃগন (৮: ৭), গণনা পুস্তক (১৬: ৩২-৩৫), দ্বিতীয় বিবরণ (১২: ২৯-৩০), ২ বংশাবলী (১৪:৯, ১৪:১২), দ্বিতীয় বিবরণ (১১: ৪-৫), ১ শমূয়েল (৬:১৯), ডয়টারনোমি (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯, ১৩:১৫), ১ শমূয়েল (১৫:২-৩), ২ শমূয়েল (১২:৩১), যিশাইয় (১৩: ১৫-১৬), আদিপুস্তক (৯: ৫-৬) প্রভৃতি নানা জায়গায়।

বিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা সাধারণতঃ বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং অরাজগতাকে প্রত্যাখান করে বলার চেষ্টা করেন, এগুলো সব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ) অধীন, যীশু খ্রীষ্টের আগমনের সাথে সাথেই আগের সমস্ত অরাজগতা নির্মূল হয়ে শান্িত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি সত্য নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে যীশু খুব পরিস্কার করেই বলেছেন যে তিনি পূর্বতন ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়মানুযায়ীই চালিত হবেন :

> এ কথা মনে কোর না, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি' (মথি, ৫: ১৭)।

খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে যীশুকে শান্তি এবং প্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন, সত্যিকারের যীশু ঠিক কতটুকু প্রেমময় এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যীশু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে :

> 'আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে কোর না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই, এসেছি তলোয়ারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বৌকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি' (মথি, ১০: ৩৪-৩৫)।

ব্যভিচার করার জন্য শুধু ব্যভিচারিনী নন, তার শিশুসন্তানদের হত্যা করতেও কার্পন্য বোধ করেন না যীশু:

> 'সেইজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করে তারা যদি ব্যভিচার থেকে মন না ফিরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব '(প্রকাশিত বাক্য, ২: ২২-২৩)।

ধর্মের সমালোচনা কেন?

মানবতাবাদীরা আর যুক্তিবাদীরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোন কিছুই তো আসলে সমালোচনার উর্ধ্বে নয়- তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্বই হোক, বা আল্লাহর ‘মহান’ বাণীই হোক। আসলে পুরো ধর্মবিশ্বাসই তো দাড়িয়ে আছে এক জলজ্যান্ত মিথ্যার উপর ভর করে। ধর্ম মানেই আজ কিছু অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার আর রীতি-নীতির সমাহার, যেগুলো কালের পরিক্রমায় উপযোগিতা হারিয়েছে। ধর্মের সমালোচনার আর একটি বড় কারণ হল, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলি তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মত নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে কাব্য চর্চা করলাম আর তারপর আলমারীর তাকে তুলে রেখে দিলাম ! ধর্মগ্রন্থগুলিতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটান হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সতীদাহর মাহাত্মকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে ৮১৩৫ জন জন নারী। এই তো সেদিনও - ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হল 'সতী মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল - কেউ টু শব্দটি করল না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম রক্ষা করে হবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পূণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনি। ধর্ম যে কি কিরকম নেশায় বুদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমান এই সতীদাহ। এ জন্যই বোধ হয় প্যাস্কাল বলেছেন - 'Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.' খুবই সত্যি কথা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা - জীবন্ত নারী মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে - আফিম

জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে - কী চমৎকার মানবিকতা ! প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পড়ছি যে, ইসলামী বিশ্বে সরিয়ার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। কোরাণের আয়াত উদ্ধৃত করে কাফিরদের বিরুদ্ধে রোজই যুদ্ধের হাঁক পাড়ছে বায়তুল মোকারমের 'বিখ্যাত' খতিব (অধুনা মৃত)। তবুও নেশায় বুদ হয়ে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'শান্তি', 'প্রগতি' আর 'সহিষ্ণুতা' খুঁজে চলেছেন মডারেট ধর্মবাদীরা ।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বেশ কিছু ভাল ভাল কথা আছে (এগুলো নিয়ে আমার বা কারোই আপত্তি করার কিছু নেই); এ গুলো নিয়েই ধার্মিকেরা গর্ববোধ করেন আর এ কথাগুলোকেই নৈতিকতার চাবিকাঠি বলে মনে করেন তারা। কিন্তু একটু সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে দেখলেই বোঝা যাবে - ভালবাসা প্রেম এবং সহিষ্ণুতার বিভিন্ন উদাহরণ যে ধর্মগ্রন্থ এবং তার প্রচারকদের সাথে লেবেল হিসেবে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো কোনটাই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের জন্য মৌলিক নয়। যেমন, যীশুখ্রীষ্টের অনেক আগেই লেভিটিকাস (১৯:১৮) বলে গেছেন, 'নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি ভালবাসবে তোমার প্রতিবেশীদের।' বাইবেল এবং কোরানে যে সহনশীলতার কথা বলা আছে, সেগুলোর অনেক আগেই (খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে) কনফুসিয়াস একইরকমভাবে বলেছিলেন - 'অন্যের প্রতি সেরকম ব্যবহার কোর না, যা তুমি নিজে পেতে চাও না'। আইসোক্রেটস খ্রীষ্টের জন্মের ৩৭৫ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, 'অন্যের যে কাজে তুমি রাগান্বিত বোধ কর, তেমন কিছু তুমি অন্যদের প্রতি কোর না'। এমনকি শত্রুদের ভালবাসতে বলার কথা তাওইজমে রয়েছে, কিংবা বুদ্ধের বাণীতে, সেও কিন্তু যীশু বা মুহম্মদের অনেক আগেই।

কাজেই নৈতিকতার যে উপকরণগুলোকে ধর্মানুসারীরা তাদের স্ব স্ব ধর্মের 'পৈত্রিক সম্পত্তি' বলে ভাবছেন, সেগুলো কোনটাই কিন্তু আসলে ধর্ম থেকে উদ্ভুত হয়নি, বরং বিকশিত হয়েছে সমাজবিবর্তনের অবশ্যাম্ভাবী ফল হিসেবে। সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে 'নৈতিক গুনাবলী' হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে; কারণ ও ভাবে গ্রহণ না করলে সমাজব্যবস্থা অচীরেই ধ্বসে পড়ত। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ বলেন,

> 'আমরা এমন কোন সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়; কিংবা উদারতাকে পাপ হিশেবে দেখা হয় আর অকৃতজ্ঞতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে।'

এমন ধরনের সমাজের কথা আমরা জানিনা কারণ অমন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। খুব সাদা চোখে দেখলেও, একটি সমাজে চুরি করা যে অন্যায়, এটি বুঝবার জন্য করার জন্য কোন স্বর্গীয় ওহি নাজিল হওয়ার দরকার পরে না। কারণ যে সমাজে চুরি করাকে না ঠেকিয়ে মহিমান্বিত করা হবে, সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে অচীরেই। ঠিক একই ভাবে আমরা বুঝি, সত্যি কথা বলার বদলে যদি মিথ্যা বলাকে উৎসাহিত করা হয়, তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষা করাই দূরূহ হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধির জন্য কোন ধর্মশিক্ষা লাগে না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, শতাব্দীপ্রাচীন কোন চলমান ব্যবস্থার

পরিবর্তন মানুষ নিজে থেকেই করেছে পরিবর্তিত মূল্যবধের কষ্ঠিপাথরে মানবতাকে যাচাই করে, এবং অনেকক্ষেত্রেই ধর্ম কি বলছে না বলছে তার তোয়াক্কা না করেই। দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ এমনি একটি ঘটনা। বলা বাহুল্য, কোন ধর্মগ্রন্থেই দাসত্ব উচ্ছেদের আহবান জানানো হয় নি। বাইবেলের নতুন কিংবা পুরাতন নিয়ম, কিংবা কোরান, অথবা বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা- কোথাওই দাসত্ব প্রথাকে নির্মুল করার কথা বলা হয়নি, বরং সংরক্ষিত করার কথাই বলা হয়েছে প্রকারন্তরে। কিন্তু মানুষ সমাজিক প্রয়োজনেই একটা সময় দাসত্ব উচ্ছেদ করেছে, যেমনিভাবে হিন্দু সমাজ করেছে সতীদাহ নির্মুল বা খ্রীষ্ট সমাজ করেছে ডাইনী পোড়ানো বন্ধ। সতীত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা, কিংবা সমকামিতা বা গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সারা পৃথিবী জুড়ে এ কয় দশকে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকগুলোই ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি : Let the data decide আর কিছু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান :

আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, আল্লাহর গুনার দোহাই দিয়ে মানুষ জনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি কি নিদারুনভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে। আল্লাহ বা ঈশ্বরের গুনার ভয় দেখিয়েই যদি মানুষ-জনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে আর রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা, আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি কোন কিছুরই আর প্রয়োজন হত না। এক ইন্টারনেট ফোরামে একটা সময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ধর্মের নৈতিকতা বিষয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম; সাথে সাথেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন - 'অভিজিৎ রায়ের মত নাস্তিক লোকজন রাষ্ট্রে আছেন বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন'। এধরনের উক্তিকে স্রেফ একজনমাত্র অজ্ঞ ধার্মিকের আস্ফালন বলে মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। এ ধরনের ধ্যান ধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন, তাদের বেশ বড় অংশই আবার সুশিক্ষিত। পাশ্চাত্য বিশ্বে ডিস্কোভারি ইন্সটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেইলজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভুত হয়েছে, সেহেতু তারা যে কোন ধরনের 'নাফরমানি' করতে পারে - সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, তালাক, গনহত্যা সবকিছু । এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল!

একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে ফিলিপ জনসনের এধরনের আবেগপ্রবণ আপ্তবাক্যারলীতে আমার বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, বরং আমার আস্থা থাকবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে; বিজ্ঞানীরা যেটিকে বলেন, 'Let the data decide'। আমি ফিলিপ জনসনের সমর্থনে এমন কোন উপাত্ত বা ডেটা খুঁজে পাইনি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশী অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উলটো সিদ্ধান্ত হাজির করছে। আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে

পুনরুজ্জীবিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশী; এও দেখা গিয়েছে যে, যে পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সে সমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোন সদস্যদের দ্বারা বেশী যৌণ নিপীড়ন হয় । ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রাঙ্গব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুরে রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। **ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মত। দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী** । আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশী । আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও ভারতের মতই ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। আল্লাহর গুনা কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিনত হত। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? **বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটিই আজ পৃথিবীর শীর্ষে।** ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেনি। পারবেও না। যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে গোলাম ফারুক অভি, এরশাদ, ফালু, গোলাম আজম, নিজামী, হাজি সেলিম, জয়নাল হাজারীর মত হত্যাকারী, ধর্ষক, গুন্ডা, ছিনতাইকারী, ডাকাত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার দরুন শুধু রেহাই ই পায় না, বরং বুক চিতিয়ে ঘুরে বেরাবার ছাড়পত্র পায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবে; তারা রোজাও রাখবে, আবার ঘুষও খাবে। তাই হচ্ছে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের দিকে তাকানো যাক। এ দেশটিতে অধিকাংশ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেক চীনা ছাত্র-ছাত্রীকেই দেকেছি ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে -‘ফ্রি থিঙ্কার’। অথচ ধর্ম নয়, শধু আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলির চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসীরা আল্লা-খোদার নামও করেন না, নরকের ভয় অথবা বেহেস্তের লোভও তাদের নেই। কোন যাদুবলে তারা তাহলে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে?

উপরের পরিসংখ্যান গুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, মানুষ নাস্তিক হলেই ভাল হবে কিংবা আস্তিক হলেই খারাপ হবে, বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবী

করতে পারে না। আসলে কোন বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের উপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। আসলে আধুনিক যুগের জীবন যাত্রার প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায়, প্রাচীন কালের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করলে আর চলবে না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রখ্যাত মনোবিদ, বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং স্কেপটিক ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মাইকেল শারমার তার The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই মানুষ কিছু নীতিকে প্রথম থেকে 'গোêেন রুল' হিসেবে গ্রহন করেছে :

Do unto others, as you would have them do unto you.

কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। মাইকেল শারমার তার গবেষনায় দেখিয়েছেন যে, মানব বিবর্তনের ধারাতেই পারষ্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুনাবলির চর্চা হয়েছে। সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষেই গড়ে উঠেছে মানবীয় Provisional ethics, যা মানুষকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।

নৈতিকতার ব্যাপারটি শুধু মানব সমাজেরই একচেটিয়া তা নয়, ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক 'ইতর প্রাণী' জগতের মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুরেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোন সদস্য মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করর্ জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, এমনকি 'দশে মিলে' কাজ করে তার জন্য খাবার পর্যন্ত নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ অপর সহযাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি মাছেরা তাদের দলের অপর কোন আহত তিমি মাছকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতীরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সবোর্চ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

একটা সময় ধর্মীয় নৈতিক বিধানগুলোর একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল হয়তো সমাজের উপর। নানা ধরনের ধর্মীয় বিধানই ছিল আইন, ওগুলোই ছিল সুনীতিবোধ গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগামীতার সাথে সাথে ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, অনেক আগেই ফুরিয়েছে ধর্মপ্রবর্তকদের ভুমিকাও। আজ আধুনিক মননের অধিকারী মানুষের কাছে প্রাচীন উপাসনা ধর্মগুলো একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে। কেউই আজ বিশ্বাস করে না তন্ত্র-মন্ত্রে অসুখ সারে, কিংবা 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে' বলে চ্যাচালেই বৃষ্টি ঝরে। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও আজ ধর্মগুরু, নবী কিংবা পয়গম্বরদের 'মহান মিথ্যার' চেয়ে

ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ, আইনের শাসন আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেক বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছে। ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিষয় গুলো অগ্রনী চিন্তার মানুষদের কাছে গুরুত্বহীন, তাদের মত ধর্মমুক্ত মানুষেরাই হয়ত আগামীর পরিবর্তিত বিশ্বে নির্ধারণ করবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এক নতুন সংজ্ঞা।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com । উপরের লেখাটি 'স্বতন্ত্র ভাবনা' বইয়ে 'ধর্ম ও নৈতিকতা' শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া 'যুক্তি' নামের পরিবর্তিত আকারে ছাপা হয়েছিলো।